দৈনিক ইত্তেফাক
দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 05 FEB 1987
পৃষ্ঠা 4-5
শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

224

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ভূমিকা

সাঈদ-উর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

বাংলাদেশের সবচে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, উপমহাদেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেরও একটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রাজা ভাঙ্গাগড়ার নীরব সাক্ষী এই প্রতিষ্ঠানের মহিমা গগনচুম্বী ও উত্তরোত্তর বর্ধমান—তবে সাক্ষী বলা বোধ হয় যথেষ্ট নয়, ইতিহাসের ধাত্রী মাতাও তাকে অনায়াসে বলা যায়।

প্রচলিত অর্থে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব তিনটি—জ্ঞান সংরক্ষণ, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ত্রয়ী দায়িত্ব পালন করে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য করতে হয়। সে-দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালনের ডিগ্রির ওপর নির্ভর করে তার সুনাম ও সাফল্য। প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে দায়িত্ব পালন করেছিল অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে। বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে, পুরোনো শহর ঢাকার মন্থর জীবনযাত্রার বাইরে থেকে রমনার সবুজ পল্লীতে গড়ে ওঠেছিল জ্ঞান সাধনার ও বিদ্যা-বিতরণের এক মহাযজ্ঞ—দেশে-বিদেশে এর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে। দেবদারু ও কৃষ্ণচূড়াগাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন নীলখেতের কালো পীচের নিদ্রিত রাস্তাগুলো জেগে উঠত প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের পদচারণায়। ভারতের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে এতজন মনীষীর সমাবেশ একই সঙ্গে ঘটে নি—নাম করা যেতে পারে সত্যেন বোস, জ্ঞান ঘোষ, হরিদাস ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রমেশ মজুমদার, নরেশ সেনগুপ্ত, সুশীলকুমার দে, ডি.এন.ব্যানার্জী, এ. এফ. রহমান প্রমুখ আচার্যের কথা।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর একটি বড় রকমের ধাক্কা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। একদিকে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক দেশত্যাগ করেন, অপরদিকে সারা পূর্ব বঙ্গের কলেজসমূহের অভিভাবকত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবোর্ড না থাকায় কলেজসমূহের পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ করার দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তায়। সেটা ঠিকমত পালন করা কঠিন হয়ে ওঠায় ১৯৫২ সালে স্নাতক পর্যায়ে পাস কোর্স পড়ানো বাদ দেওয়া হয়, ১৯৬২ সাল থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বও শিক্ষাবোর্ডের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে অধিভুক্ত কলেজের চাপও কমে। তবু, এখনো ১৬৪টি অধিভুক্ত কলেজ (১২টি আইন কলেজ ও ১৫২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ) ও ২১টি উপাদানকল্প কলেজের (১৩টি চিকিৎসা, নার্সিং ও গবেষণা বিষয়ক, ৪টি শিক্ষা প্রশিক্ষণ বিষয়ক, ১টি গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ক ও ৩টি প্রকৌশল কারিগরি বিষয়ক) অভিভাবকত্ব বিশ্ববিদ্যালয় পালন করছে। নতুন কলেজের অনুমোদন দেওয়া, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করা, পাঠক্রম নির্ধারণ করা কিংবা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এই দায়িত্বের অন্তর্গত। দায়িত্ব পালন হয়তো সবসময় সুষ্ঠুভাবে হয় না, কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না-থাকায় জাতীয় প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতেই হচ্ছে। দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে অধিভুক্ত কলেজসমূহে পরীক্ষার কাজ পরিদর্শনে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা লাঞ্ছিত হয়েছেন, তেমন ঘটনার দুঃখজনক নজিরও আছে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নতুন করে শিক্ষাদানে সংকট সৃষ্টি হয়। বেশ কজন অভিজ্ঞ শিক্ষক শহীদ হন, সরকারী দায়িত্ব পেয়ে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বিষয়টি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। সর্বাধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এখানে থাকায় সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অনেককে সাড়া দিতে হয়। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সমাজের নতুন দাবি উত্থাপিত হয়—সেটা হল অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগে সহায়তা করা। কয়েকজন শিক্ষক সরাসরি তাতে অংশ নিলেন—মন্ত্রী হয়ে, রাষ্ট্রদূত হয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-বীমার চেয়ারম্যান হয়ে বা বিভিন্ন কমিশন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সার্বক্ষণিক সদস্য বা প্রধান হয়ে। সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে যেসব কমিশন গঠিত হল, তাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সদস্য হলেন। টেক্সট বুক বোর্ডকে সাহায্য করতে হল শিক্ষকদের নতুন প্রয়োজনে স্কুল-কলেজের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনায়।

বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্ততঃ আরো দুটো কাজে অংশ নিতে হচ্ছে। প্রথমটি হল, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ইনষ্টিটিউট অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স, সেন্টার পর ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এণ্ড রিসার্চ ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতে শিক্ষকেরা অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠান নিজেদের কর্মচারীকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইলে তাদের জন্য কোর্সের আয়োজন করতে হয়। বাণিজ্য অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনষ্টিটিউট তাদের জন্য পরিচালনা করে 'নির্বাহী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স'। ইনষ্টিটিউট এ ধরনের বিশটি সংক্ষিপ্ত কোর্স দান করেছে ১৯৮৩-৮৪ সালে। তাছাড়া রয়েছে কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য বিজ্ঞান অনুষদ কর্তৃক পরিচালিত 'গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান কোর্স'। ইংরাজি বিভাগ চালু করেছে 'ইংলিশ ফর স্পেশাল পারপাস।' দ্বিতীয়টি হল, সরকারী বা বেসরকারী বিভিন্ন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রণয়নে সাহায্য করা, অথবা সুপরিচিত শব্দে যাকে বলা হয় কনসালটেনসী সার্ভিস প্রদান করা। কোন কোন শিক্ষক বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন তবে অধিকাংশই নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া রয়েছে রেডিও-টেলিভিশনের প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনের আলোচনায়-সেমিনারে বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকা। সমাজের দাবি এত বিরাট যে, বুদ্ধদেব বসু আমলের (১৯২৭-৩১) 'কচিৎ-দৃষ্ট, কচিৎ-শ্রুত ও কচিৎ-কথিত' উপাচার্যকেও আজকে হরহামেশা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে যেতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রথম পঞ্চাশ বছর এদেশ ছিল বিদেশের উপনিবেশ—প্রথমে ব্রিটেনের, পরে পাকিস্তানের। স্বাধীনতার পরও সমাজের কাঠামোতে গণমুখী পরিবর্তন আসেনি। ফলে প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষের শাসন অগ্রাহ্য করে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকা নিতে হয়েছে জাতীয় প্রশ্নে। ঔপনিবেশিক আমলে তারা চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাদেশিক অভিমান জাগ্রত করতে। স্বদেশী মনীষীদের সম্মানিত করা ও দেশী বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করার পাশাপাশি ছিল ইংরেজ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ছাত্রদের সরাসরি অংশগ্রহণ—যথাসম্ভব পৃষ্ঠপোষকতা ছিল শিক্ষকদেরও। বিশের দশকের শেষদিকে অনিল রায় প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীসংঘ', লীলা নাগ স্থাপিত 'দীপালি সংঘ' কিংবা অধ্যাপক সৈয়দ আবুল হুসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তরুণদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল বৃহত্তর জনসমাজের দিকে। ১৯৩০ সালে পুলিশের হামলায় কার্জন হলে শহীদ হন অজিত ভট্টাচার্য, পরের বছর বন্দী হন লীলা নাগ—ভারতের প্রথম মহিলা রাজবন্দী। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বক্তব্য রাজনৈতিক ছিল না, কিন্তু সদস্যদের আধুনিক চিন্তা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল মুসলমান সমাজের অচলায়তনে। সেই স্বাদেশিক চেতনা নতুনভাবে প্রকাশিত হয় দেশবিভাগের পর—বিশেষতঃ পঞ্চাশের দশকে। পাকিস্তানীরা বাঙালীদের উপর জাতিগত নির্যাতন শুরু করলে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শিক্ষক ও ছাত্ররা একতাবদ্ধ হন। কালে কালে সেটা জাতীয়তাবাদী শক্তিতে পরিণত হয় এবং তাতে আরো শক্তি যোগায় শিক্ষকদের প্রচারিত 'পাকিস্তানের দুই অর্থনীতি' তত্ত্ব। এভাবে ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান রচনা করে স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি। স্বাধীনতার পতাকা প্রথম ওড়ানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, স্বাধীনতার ইশতাহারও পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা। তারপরে আসে একাত্তরের সংগ্রাম। যুদ্ধে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও উপাচার্যের ভূমিকা অল্পবিস্তর সবারই জানা।

স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরও আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নষ্ট করা হয়, সাম্প্রদায়িক চেতনা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলে, সমাজতন্ত্রের ধারণাকে বিপর্যস্ত করা হয়—সামরিক আমলাতন্ত্র বার বার চেপে বসে দেশের উপর। রাজা যায়, রাজা আসে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নতি হয় না। রাজনীতিবিদেরা ব্যর্থ হন তার মোকাবিলায়। সুতরাং ছাত্ররা লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরীতে নিবিষ্টচিত্ত হতে পারে না। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাদের প্রতিবাদের মশাল জ্বালতে হয়। সেই মশালই উজ্জীবিত ও আশ্বস্ত রেখেছে দেশের মানুষকে। ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন একজন উপাচার্য, কারারুদ্ধ হয়েছেন কয়েকজন তরুণ শিক্ষক, আত্মাহুতি দিয়েছেন জাফর-জয়নাল-তাজুল-মোজাম্মেল-বসুনিয়া প্রভৃতি অনেক শিক্ষার্থী, ভস্মীভূত হয়েছে একটি ছাত্রাবাস। কিন্তু সে মশাল নির্বাপিত হয়নি—তা অধিকতর প্রভা বিকীরণ করছে।

এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ওপর অর্পিত সমাজের দায়িত্ব পালন করে চলছে এবং ইতিমধ্যে সৃষ্টি করেছে অপরাজেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাবমূর্তি।